মহাপতঙ্গ
আবু ইসহাক

ছোট এক শহরের ছোট এক বাড়ি। সেই বাড়ির উত্তর দিকের দেওয়ালের ফোকরে থাকত একজোড়া চড়ুই পাখি। একদিন কুড়িয়ে খেতে মাঠে গিয়েছিল ওরা, হঠাৎ কেমন অত শব্দ শুনে ওরা সচকিত হয়ে ওঠে। মাথা তুলে একে অন্যের দিকে তাকায়।

দূর থেকে বোঁ-বোঁ শব্দ ভেসে আসছে।

চড়ুই দুটো ভয় পায়। ফুড়ুৎ করে ওরা গাছের ডালে গিয়ে বসে। শব্দ ক্রমেই বাড়ছে। চারদিকের পাখপাখালি উর্ধ্বশ্বাসে পালাচ্ছে। চড়ুই পাখি দুটো পাতার ফাঁক দিয়ে উঁকি মারে। দূর দিগন্ত থেকে প্রকাণ্ড একটি কী এদিকেই উড়ে আসছে। ভয়ে ওরা ঘন পাতার ভেতর লুকিয়ে পড়ে। ভয়ঙ্কর বোঁ-বোঁ আওয়াজ করতে করতে ওদের মাথার ওপর দিয়েই ওটা চলে যায়।

বুক দুরু দুরু করে দুটোরই। কিছুক্ষণ পরে সম্বিৎ ফিরে পেয়ে চড়ুই ওর সঙ্গিনীকে বলে,

-চিনতে পেরেছ তো?

-উঁহু।

-আরে! বাবা তো এটার কেচ্ছাই শুনিয়েছিল একদিন, মনে নেই?

-অহ হো, মহাপতঙ্গ?

-হ্যা, হ্যাঁ তাই।

চড়ুই পাখি দুটোর শিশুকালের কথা। পুরাতন এক বাড়ির দেওয়ালের ফোকরে ছিল ওদের মা-বাবার নীড়। মা-বাবার ডানার মধ্যে মুখ লুকিয়ে ওরা তখন রাক্ষস-খোক্ষস আর দেও-দুরাচারের কেচ্ছা শুনত। ছোঁ-রাক্ষস, ম্যাও-খোক্ষস, কুণ্ডলী-ফোঁসফোঁস ও কা-ভক্ষুসের কথাই বেশি করে বলত মা-বাবা। কারণ এগুলোই ওদের প্রধান শত্রু।

এক অন্ধকার রাতে মা ছোঁ-রাক্ষসের গল্প বলছিল। ছোঁ-রাক্ষস আমাদেরই মতো পাখাওয়ালা আকাশচারী জীব। ওদের দৃষ্টি খুব তীক্ষ্ণ। ওরা মটির দিকে চোখ রেখে আকাশে ভেসে বেড়ায়, সুযোগ পেলে চোখের পলকে ছোঁ মেরে বাঁকা নখে বিধিয়ে ধরে নিয়ে যায়। তারপর গাছে বসে ঠোকর মেরে চোখ খায়, বুক খায়, কলজে খায়।

ছানা দুটো ভয়ে ওদের মার ডানার মধ্যে মুখ লুকায়। জোছনা উঠলে ওদের ভয় কমে। তখন নর-ছানাটা শুধায়, –

আচ্ছা মা, সবচেয়ে বড় পাখি কোনটা?

-তোর বাপকে জিজ্ঞেস কর। উনি দেখেছেন। বল না গো, সেই বড় পাখির গল্পটা।

-হ্যাঁ বলছি। অনেক আগে। আমরা তখন ছিলাম অনাবৃষ্টির দেশে। তোদের মা ডিমে তা দিচ্ছিল। আমি গিয়েছিলাম কুড়িয়ে খেতে। হঠাৎ শুনি বিকট শব্দ। চেয়ে দেখি অতি প্রকাণ্ড এক পাখি বোঁ-বোঁ আওয়াজ তুলে উড়ে যাচ্ছে। উড়ে যাচ্ছে অনেক দূর দিয়ে- আকাশ যেখানে গাছের মাথায় ঠেকেছে সেখান দিয়ে। এত বড় বিরাট পাখি আর কখনও দেখিনি।

-এটা কি ছোঁ -রাক্ষসের মতো ছোঁ মারে? মাদি ছানাটা রীতিমতো কৌতূহলী হয়ে ওঠে।

-তা তো দেখিনি, মা। ঐ একদিনই দেখেছি ওটা। ওটা দেখতে? ইতস্তত করে চড়ুই। -হ্যাঁ, ওটা দেখতে অনেকটা ফড়িং-এর মতো। লেজ-লম্বা ফড়িং দেখেছিস তো? ঐ যে বৃষ্টির দিনে একটা মেরে এনে তোদের খাইয়েছিলাম।

-হা হা, দেখেছি। দুটো ছানাই বলে।

-সেই ফড়িং-এর মতো পাখা আর লম্বা লেজ। সে এক মহাপতঙ্গ। কত যে বড়, না দেখলে বোঝা যাবে না।

বোঁ-বোঁ শব্দ করে উড়ে বেড়ায়।

পিতার বর্ণনার সাথে হুবহু মিলে যাচ্ছে। আজকের এ আকাশচারী জীবটা মহাপতঙ্গ না হয়ে যায় না।

পক্ষিরাজ্য ভীত – সন্ত্রস্ত। এরকম পাখি এর আগে কেউ কখনও দেখেনি এ দেশে। গাছে গাছে পাখিদের জরুরি সভা বসে।

এক পাখি বলে, ভয়ের কোনো কারণ নেই। আমার মনে হয় এটা শস্যভোজী। মাংসভোজী রাক্ষস নয়। প্রতিবাদ করে অন্য পাখি বলে, না, না, এটা নিশ্চয় রাক্ষস পাখি। রাগের চোটে কেমন বোঁ-বোঁ করছিল।

আর এক পাখি সমর্থন করে বলে, ঠিকই, এটা রাক্ষস পাখি। তর্জন-গর্জন শুনেও বুঝতে পার না তোমরা? এটা খপাখপ ধরবে আর টপাটপ গিলবে। যদি বাঁচতে চাও, তবে এ দেশ ছেড়ে পালাও।

পালিয়ে যায় অনেক পাখিই। বেশির ভাগ যায় অনাবৃষ্টির দেশে। চড়ুই পাখি দুটো কিন্তু দেশ ছাড়ে না। কারণ ঘনবৃষ্টির দেশে ঝড়-বৃষ্টিতে কষ্ট হলেও পেট ভরে খেতে পাওয়া যায়। তা ছাড়া, এ মহাপতঙ্গ অনাবৃষ্টির দেশেও দেখা দিয়েছে। ওদের জনক স্বচক্ষে দেখেই গল্প বলেছিল। চড়ুই দম্পতি তুলো, পালক, শুকনো খড় ঠোঁটে করে ফোকরে এনে জমা করে। সাজিয়ে গুজিয়ে সেখানে নীড় রচনা করে। বাড়ির বাসিন্দা দোপেয়ে দৈত্য ওদের দেখে খুশি হয়। স্ত্রী ও ছেলে মেয়েদের ডেকে বলে, লক্ষণ শুভ। ঐ দেখো, চড়ুই পাখি বাসা বাঁধছে। এগুলো ভালো দেখে আসে, মন্দ দেখে চলে যায়। এ বছরটা সুখে-শান্তিতে কাটবে।

কিন্তু সুখে-শান্তিতে দিন কাটে না। বন্যায় দেশ ডুবে যায়। দিন দিন পানি বাড়তে থকে। বাড়ির মালিক দোপেয়ে দৈত্য এবং আর অনেকে দেশ ছেড়ে চলে যায়। যারা যেতে পারে না, তারা প্রাণের দায়ে বাড়ির ছাদে, ঘরের চালে, গাছের ডালে উঠে হা-হুতাশ করে। চড়ুই পাখি দুটোরও দুর্দশার অন্ত নেই। ওদের প্রতিবেশী চড়ুই পাখিগুলো অনেকেই দেশ ছেড়ে পালিয়েছে। কিন্তু ওদের পালাবার উপায় নেই। বাসায় রয়েছে কলজের টুকরো দুটো কচি ছানা। ওদের ফেলে আর যাওয়া যায় না।

এমন দুঃসময়ে বোঁ-বোঁ আওয়াজ তুলে আসে এক মহাপতঙ্গ। চড়ুই দুটো উঁচু গাছের ডালে ঘন পাতার আড়ালে বসে চেয়ে দেখে। মহাপতঙ্গাটা কয়েক পাক ঘুরে একটা জলা মাঠে নামে।

দোপেয়ে দৈত্যরা হৈ-হৈ শুরু করে দেয়। মহাপতটা সাঁতার কেটে একটা বড় বাড়ির ছাদে সিঁড়ির কাছে গিয়ে থামে। কী অবাক কাণ্ড! একটা দোপেয়ে দৈত্য মহাপতঙ্গের পেট থেকে বেরিয়ে আসে। তার আহ্বানে এক এক করে একপাল দোপেয়ে দৈত্য মহাপতঙ্গোর পেটের মধ্যে ঢুকে পড়ে। ওটা এবার বোঁ-বোঁ ডাক দিতে দিতে আকাশে ওঠে। দুপাক ঘুরে সোজা সূর্যাস্তের দিকে চলে যায়।

ঐ দিন আরও কয়েকবার মহাপতঙ্গ আসে। বাড়ির ছাদে, ঘরের চালে, গাছের ডালে ছিল যেসব দোপেয়ে দৈত্য তাদের পেটে পুরে কোথায় উধাও হয়ে যায়।

চড়ুই পাখি দুটোর বিস্ময়ের সীমা নেই। রাতে বাসায় বসে স্ত্রী চড়ুই বলে,

-দোপেয়ে দৈত্যরা তো যেমন তেমন টেটন নয়।

-হ্যা, জবর টেটন। পুরুষ চড়ুই বলে, ওরা মহাপতঙ্গকেও দেখছি পোষ মানিয়েছে।

-সত্যি, ওদের বুদ্ধি-কৌশলের তারিফ করতে হয়।

-কেন, মা? বুকের তলা থেকে নর-ছানাটা জিজ্ঞেস করে।

-হ্যাঁরে, হ্যাঁ। বড় হয়ে যখন বাইরে যাবি তখন দেখতে পাবি। হাম্বা-হাম্বা, ভ্যাঁ-ভোম্বল, ঘেঁউ পা-চাটা, কুক্কুরুত, প্যাঁক টৈটৈ, ম্যাও-খোক্কস, শুশুধর, চিহি-টগবগ আরও কত জীব-জানোয়ারকে যে ওরা পোষ মানিয়েছে তার ইয়ত্তা নেই।

-এই হাম্বা-হাম্বার অবস্থা দেখে আমার হাসিও পায়, দুঃখও লাগে। পুরুষ চড়ুই বলে, বেচারাকে নানান কাজে খাটিয়ে তো মারেই, উপরন্তু ওর পেটের নিচের ঝুলেপড়া চামড়া টেনে টিপে সাদা রস বের করে করে দোপেয়ে দৈত্যরা নিজেদের গলা ভেজায়।

স্ত্রী চড়ুই হেসে বলে, আবার দেখো, বিরাটকায় শুশুধর, চিহি-টগবগ- ওদের পিঠে চড়ে কেমন মনের সুখে ঘুরে বেড়ায়।

– এতেও সাধ মেটেনি। এবার মহাপতঙ্গের পেটের মধ্যে জায়গা করেছে। দল বেঁধে ওর পেটের মধ্যে বসে এখন মহানন্দে আকাশে পাড়ি জমাতে শুরু করেছে।

স্ত্রী চড়ুই বলে, এবার দোপেয়ে দৈত্যরা কিন্তু ভারি বিপদে পড়েছিল। মহাপতঙ্গাকে পোষ মানিয়েছিল তাই রক্ষা।

কিছুদিন পরে পানি শুকিয়ে যায়। দেশ ছেড়ে চলে গিয়েছিল যে সব দোপেয়ে দৈত্য তারা দেশে ফিরে আসে। কিন্তু দেশে খাবার নেই। খেতের ফসল ভেসে গেছে বন্যায়। চারদিকে হাহাকার। চড়ুই পাখি দুটোরও দুর্দশার অন্ত নেই। বন্যার সময় দোপেয়ে দৈত্যরা বাড়ির ছাদে যেসব খাদ্যশস্য ফেলে গিয়েছিল তাই কাড়াকাড়ি করে খেয়ে এতদিন চলেছে। কিন্তু এখন দুটো ঘাসের দানাও কুড়িয়ে পাওয়া যায় না। এই দুর্দিনে আবার পেটে দুরন্ত ক্ষুধা নিয়ে দুটো নতুন ঠোঁটের আবির্ভাব হয়েছে। ক্ষুধার জ্বালায় সেগুলো খালি ট্যাঁও ট্যাঁও করে। বাসায় ঢুকবার সাথে সাথে ঠোঁট ফাঁক করে এগিয়ে আসে আ-দে-দে-দে।

চড়ুই পাখি দুটো মাঠে খাবার সন্ধানে ঘুরে বেড়ায়। এমন দিনে আবার শব্দ শোনা যায়, বোঁ-বোঁ-বোঁ।

মহাপতঙ্গ এসে মাঠে নামে। দোপেয়ে দৈত্যরা তার পেট থেকে বস্তা বস্তা কী সব নামিয়ে নেয়। এটা উড়ে চলে গেলে আর একটা মহাপতঙ্গ আসে। তারপর আরেকটা- আরও কয়েকটা । সবগুলোই বস্তা বস্তা কী সব দিয়ে চলে যায়। চড়ুই দুটোর কৌতুহল জাগে। ফুড়ুৎ লাফ দিয়ে ওরা এগিয়ে যায়। কাছাকাছি গিয়ে দেখে ওদের স্বজাতি কয়েকটা গিয়ে হাজির হয়েছে ওখানে। খুঁটে খুঁটে কী যেন খাচ্ছে।

ফুড়ুৎ করে উড়ে ওরাও ছুটে যায়। কী আশ্চর্য! খাবার দিয়ে গেছে মহাপতঙ্গ ক্ষুধার খাবার। আনন্দ। আনন্দ! কী আনন্দ! বস্তা থেকে ঝরে পড়ছে কত খাবার।

দুটো ঠেসে পেট পুরে খায়। বাসায় ফিরে বাচ্চা দুটোকে খাওয়ায়। আঃ কী শান্তি!

অনেক দিন পরে আজ চড়ুই দম্পতি খোশ মেজাজে গল্প করে। গল্প ঠিক নয়। দোপেয়ে দৈত্যের গুণকীর্তন।

পুরুষ চড়ুই বলে, দোপেয়ে দৈত্য সমস্ত দুঃখ-শান্তি দূর করতে পারে। ওরা ইচ্ছে করলে আরও সুন্দর করতে পারে পৃথিবীকে।

– হ্যা, তা পারে। ওরা যদি করে পণ, করে দুঃখ বিমোচন। স্ত্রী চড়ুইটা কৃতজ্ঞতায় গানই জুড়ে দেয়। ওর সঙ্গীও যোগ দেয় সে গানে। ছানা দুটো মুগ্ধ হয়ে শোনে।

মহাপতঙ্গ যে খাদ্যশস্য দিয়ে যায়, সেগুলো দোপেয়ে দৈত্যদের ঘরে ঘরে আসে। দেয়ালের ফোকরে আবার চড়ুই দম্পতির সুখের ঘরকন্না চলে। স্ত্রী চড়ুই জোড়া ডিম পাড়ে। দুটিতে পালা করে তা দেয়। জোড়া জোড়া বাচ্চা ফোটে। সারাদিন ধরে শস্যকণা কীট-পতঙ্গ কুড়িয়ে এনে বাচ্চাদের ঠোঁটে ঢুকিয়ে খাওয়ায়। ওরা বড় হয়ে ওঠে। ওদের কাছে ছোঁ- রাক্ষস, ম্যাও-খোক্ষস, কুণ্ডলী-ফোঁস ফোঁস ও রাক্ষসের কেচ্ছা বলে। এসব রাক্ষস-খোক্ষস ও দেও-দুরাচারের কেচ্ছা শুনে বাচ্চাগুলো মুষড়ে পড়ে। তখন ওরা সুন্দর পৃথিবীর গল্প শুরু করে দেয়। রং-রসের বৈচিত্র্যে প্রাণবন্ত এ পৃথিবী। পানি আর বাতাসের প্রাচুর্যে প্রাণবন্ত পৃথিবী। ফুল-ফল-শস্যের সম্ভারে সমৃদ্ধ এ পৃথিবী। দুঃখের তুলনায় অনেক সুখ এখানে। গল্পে গল্পে দোপেয়ে দৈত্যের প্রসঙ্গ এসে যায়। এদের বুদ্ধি, কৌশল ও গুণ হেকমতের অনেক গল্প চলে। তারপর চলে মহাপতঙ্গের গল্প। বন্যা ও দুর্ভিক্ষের সময় কত মহান কাজ করেছে এগুলো।

এভাবে দিন যায়। মাস পেরোয়। বছর ঘোরে। একদিন ভোর বেলা। উড়ু উড়ু বাচ্চা দুটোকে খেলার ছলে আত্মরক্ষার নানা কৌশল শিখিয়ে দিচ্ছিল পাখি দুটো। হঠাৎ স্ত্রী চড়ুই বলে ওঠে , ঐ যে শব্দ । মহাপতঙ্গ আসছে।

-হ্যা, তাই তো! মহাপতঙ্গই আসছে। পুরুষ চড়ুই বলে, এবার আবার কী নিয়ে এল?

-নিশ্চয়ই ভালো খাবার-টাবার নিয়ে এসেছে। চল না দেখে আসি।

-আমরাও যাব, মা। ছানা দুটো আবদার করে।

-না রে, না। তোরা এখনও ভালো করে উড়তে পারিসনে। আমরা গিয়ে দেখে আসি।

-আমাদের ভয় করবে যে। মাদি ছানাটা বলে।

-ভয়! দিনে-দুপুরে আবার কিসের ভয়?

ম্যাও-খোক্ষস আসে যদি?

-দূর বোকা! ম্যাও-খোক্ষস এ দেয়াল বেয়ে উঠতেই পারবে না।

-কুণ্ডলী-ফোস ফোস যদি আসে?

উহু, কুণ্ডলী-ফোঁস ফোঁস এ খাড়া দেয়াল বেয়ে উঠতে পারবে না। তোরা বড় হয়ে এরকম জায়গা বেছে নিয়ে বাসা বাঁধবি। এ রকম জায়গায় যদি আসে তো কা-ভক্ষুস পারে।

-কা-ভক্ষুস!

বাচ্চা দুটো ভয়ে শিউরে ওঠে। ওদের মা বুঝতে পেরে বলে, থাক সে কথা, আমি ওদের কাছে থাকি। তুমিই গিয়ে দেখে এসো।

-আচ্ছা, তুমি থাক ওদের নিয়ে। আমি গিয়ে দেখে আসি। মহাপতঙ্গ খাবার নিয়ে এলে তোমাদের জন্য টোপলা ভরে নিয়ে আসব। পুরুষ চড়ুই ঢেউয়ের তালে নাচতে নাচতে উড়ে যায়।

মহাপতঙ্গ ঠিকই। আর এসেছে একটা নয়, এক জোড়া নয়, পাঁচ জোড়া। চড়ুই খুশি হয়। অনেক খাবার নিয়ে এসেছে নিশ্চয়।

চোওঁ করে একটা মহাপতঙ্গ নেমে যায় অনেক নিচে।

একি! ছোঁ মারবে নাকি? ঐ তো উপর দিকে উঠছে আবার, কিন্তু ওটার পেট থেকে পড়ছে কী ও?

চড়ুই ভাবে, নিশ্চয়ই ডিম। বা রে বা, বড় পাখির বড় রং, আন্ডা পাড়ার দেখ ঢং।

বুম- ম্- ম্-

প্রচণ্ড শব্দে মূছা যায় চড়ুই পাখি। ঘুরতে ঘুরতে সে একটা ঝোপের ওপর পড়ে।

বেলা যখন গড়িয়ে যায় তখন জ্ঞান ফিরে আসে। কিন্তু শরীরে এতটুকু বল নেই। সে চোখ মেলে। ঝোপের ওপর কাত হয়ে শুয়েই সে মিটমিট করে তাকায় এদিক-ওদিক।

এ কোথায় সে? কেমন করে সে এল এখানে, এই ঝোপের ওপর? কী হয়েছিল তার?

চড়ুইটি প্রথমে কিছুই মনে করতে পারে না।

অনেকক্ষণ ধরে ঘটনাটা মনে করার চেষ্টা করে সে। তারপর আস্তে আস্তে সব মনে পড়ে যায়। মনে পড়ে আর বিস্ময় জাগে- ডিমটা বুঝি ফেটেই গেছে। তাই তো এমন শব্দ। বড় পাখির বড় ডিম। এরকম শব্দ তো হবেই। চড়ুই ভাবে কিন্তু এভাবে ডিম পেড়ে লাভটা কী? মাটিতে পড়ে ফেটেই তো গেল, তা দিয়ে বাচ্চা ফোটাতে পারল না আমাদের মতো।

বাচ্চা ফোটানোর কথা ভাবতে গিয়ে নিজের বাচ্চা দুটোর কথা মনে পড়ে যায় তার। বাচ্চা দুটো নিয়ে স্ত্রী সেই সকাল থেকে ওর পথ চেয়ে বসে আছে। ক্ষুধার জ্বালায় কত না জানি কষ্ট পাচ্ছে ওরা। কিন্তু একটা দানাও যে যোগাড় হয়নি। কী ব্যাপারটাই না ঘটে গেল। ওরা কি শুনতে পেয়েছে ডিম ফাটার শব্দ?

চড়ুই কোনোরকমে গা ঝাড়া দিয়ে ওঠে। ফুড়ুৎ করে সে উড়াল দেয়। হঠাৎ নিচে চোখ পড়ে চড়ুই পাখির। পথ ভুল হল নাকি। চড়ই চমকে ওঠে, কোন পথে এল সে? এরকম দেখাচ্ছে কেন? না, পথ ভুল হবার কথা তো নয়।

তালগাছ ডানে রেখে দুই আমগাছের ফাঁক দিয়েই তো এসেছে সে। কিন্তু আন্ডা রঙের উঁচ বাড়িটা কোথায় গেল? ঐ দিকে নারকেলের গাছটা তো ঠিকই আছে।

চড়ুই উড়ে যায় দুদিকে নিশানা ঠিক রেখে। কিন্তু সব নিশানা পাওয়া যাচ্ছে না। ঐ যে তেঁতুল গাছ। কিন্তু ওটার এমন ছিন্ন-ভিন্ন চেহারা কেন? কিছু ভেবে পায় না চড়ুই। যাকগে, আর একটু গেলেই কাউন রঙের বাড়িটা।

কিন্তু কোথায় সে কাউন রঙের বাড়ি?

চড়ুই পাখির বুকের ভেতর ছ্যাঁৎ করে ওঠে। নিচে চেয়ে দেখে ধ্বংসস্তূপ। লণ্ডভণ্ড সব। সে চিল্কার করে ওঠে। স্ত্রীর নাম ধরে ডাকে। বাচ্চা দুটোর নাম ধরে ডাকে। কিন্তু সে ডাক ফিরে আসে প্রতিধ্বনি হয়ে।

ইটের ফাঁকে ফাঁকে খোঁজে চড়ুইটি। কিন্তু কোনো চিহ্ন নেই তার স্ত্রী আর বাচ্চা দুটোর। শুধু এক জায়গায় মুমূর্ষ অবস্থায় পড়ে যন্ত্রণায় কাতরাচ্ছে বাড়ির বাসিন্দা দোপেয়ে দৈত্য।

ব্যথায় ছটফট করে চড়ুই। ডানা ঝাপটায়। ঠোঁট দিয়ে বুকের পালক কাটে। বিলাপ করতে করতে সঙ্গিনী ও ছানা দুটোর কত কথাই না ইনিয়ে বিনিয়ে বলে যায়।

নিঃসঙ্গ এক চড়ুই পাখিকে প্রায়ই দেখা যায় জানালার ধারে, রেলিং-এর ওপর। ঘৃণার স্বরে সে ডেকে যায়,

ছিঃ ছিঃ ছিঃ ছিঃ ছিঃ।

এ ছিঃ ছিঃ কিসের জন্য? এ ধিক্কার কাদের জন্য? এ নিশ্চয় তাদের জন্য যারা ডিম্ববতী মহাপতঙ্গিনীর পেটে চড়ে উড়ে বেড়ায়, আর অশান্তি ডেকে আনে।